মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182 Mb
Book No. 900·7

N. L. 38.
MGIPC—S1—12 LNL/58—23-5-58—50,000.

NATIONAL LIBRARY
No Imp 4231
DATE 18/9/69
CALCUTTA

টীকা লিখেন, ইনি তাহার উপরে আবার টিপ্পনী করেন। সে কালে সকল উপাধির শ্রেষ্ঠ উপাধি যে মহোপাধ্যায়, তাহাই তিনি পাইয়াছিলেন।

কুমারচন্দ্র ও কুমারবজ্র

কুমারচন্দ্র আচার্য্যও অবধূত ছিলেন। ইনি বাঙ্গালী, মগধের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা দেশে বিক্রমপুরী বিহারে বসিয়া কৃষ্ণযমারিতন্ত্রের ও বজ্রভৈরবতন্ত্রের টীকা লিখিয়া যান। আরও একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত কুমারবজ্র চক্রসম্বরের উপর পুস্তক লিখেন ও চক্রসম্বরের উপর আরও কয়েকখানি পুস্তক তর্জ্জমা করেন এবং একখানি পুস্তকের ভুটিয়া তর্জ্জমা শোধন করিয়া দেন।

চন্দ্রগোমিন্

চন্দ্রগোমীর নিবাস পূর্ব্বভারতে বরেন্দ্রদেশে, ইহাঁর উপাধি আচার্য্য, মহাপণ্ডিত। ইনি নামসংগীতির টীকা করেন, অনেক স্তবস্তোত্র লিখেন। তারাভট্টারিকা, সিংহনাদলোকেশ্বর, হয়গ্রীব, সিতাতপত্রা অপরাজিতা প্রভৃতি দেবতার পূজা প্রচার করেন। ইনি অকালমরণ-নিবারণ, বিঘ্ননিবারণ, পরসৈন্যধ্বংসন, ভয়ত্রাণ, কুষ্ঠচিকিৎসা, জ্বররক্ষা, পশুমারিরক্ষা প্রভৃতি শান্তি, পুষ্টি ও অভিচারকর্ম্মের পুস্তক লিখেন।

চন্দ্রশ্রী

পূর্ব্বভারতনিবাসী ভিক্ষু চন্দ্রশ্রী আর্য্য অবলোকিতেশ্বরের স্তব ও তাহার ভুটিয়া তর্জ্জমা লিখেন।

ডোম্বী হেরুক

ইনি একজন মগধের রাজা, সন্ন্যাসী হইয়া প্রথমে আচার্য্য, পরে মহাচার্য্য, পরে সিদ্ধ-মহাচার্য্য উপাধি পান। ইনি নামসংগীতির বৃত্তি লিখেন, গুহ্যবজ্রতন্ত্ররাজের বৃত্তি লিখেন, একবীর, নৈরাত্মাযোগিনী পূজাপদ্ধতি লিখেন এবং যোগযোগিনীর সাধারণ অর্থের উপদেশ দেন।

তথাগত রক্ষিত

উড়িষ্যা দেশে ভজ্জমা নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় কায়স্থবংশে এক পরিবার চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন। সেই বংশে তথাগতরক্ষিত সিততারা, নীলতারা, পীততারা, রক্ততারা ও হারীততারার উপাসনা প্রচার করেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত বই ভুটিয়া ভাষায় তর্জ্জমা করেন।

তৈলিকপাদ বা তেলিপ

ইনি একজন উড়িষ্যাবাসী সিদ্ধমহাচার্য্য, একখানি দোহাকোষ লিখেন, তত্ত্বচতুরোপদেশের প্রসন্নদীপ নামে টীকা লিখেন।

দিবাকরচন্দ্র

দিবাকরচন্দ্র নামে একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত সহস্রভুজনেত্রসাধন নামে একখানি সংস্কৃত পুস্তকের ভুটিয়া তর্জ্জমা করেন।

ধর্ম্মশ্রীমিত্র

উড়িয়ানিবাসী মহোপাধ্যায় ধর্ম্মশ্রীমিত্র অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে বজ্রভৈরবসাধন, কালযমারিসাধন, আর্য্যাচলসাধন ও জ্ঞানসত্ত্বসাধনপূজাবিধি পুস্তক।

নাড়পাদ

ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু। তিব্বত দেশে ইহাঁর নাম নারো। ইহাঁর স্ত্রীর নাম জ্ঞানডাকিনী নিগু। ইহাঁরা স্ত্রীপুরুষেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন এবং হেবজ্রসাধনের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। নাড়পাদ কাশ্মীর দেশের শ্রীপট্টিকেরক গ্রামের কনকস্তূপ মহা-বিহারের ভিক্ষু বিনয়শ্রীমিত্রের অনুরোধে বজ্রপাদসারসংগ্রহপঞ্জিকা নামে এক গ্রন্থ লিখেন। এই পুস্তকের এক নকল বাঙ্গালা দেশের রাজা হরিবর্ম্মদেবের আমলে তৈয়ারি হয়। নাড়পাদের উপাধি আর্য্য, শ্রী, আচার্য্য, মহাচার্য্য, মহাপণ্ডিত, মহাযোগিন্। বজ্রগীতি নামে তাঁহার দুইখানি গানের বই আছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, নাড়পণ্ডিত লুইএর সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের আগেকার লোক। তিনি ছিলেন মহাযোগী, লুইএর দল ছিল সিদ্ধাচার্য্য যোগী। নাড়পণ্ডিতের এক উপাধি আছে আর্য্য। এ উপাধির অর্থ কি? বৌদ্ধ ভিক্ষু হইয়া যাঁহারা বিবাহ করিতেন, গৃহস্থাশ্রমে থাকিতেন, অথচ পণ্ডিত বা যোগী হইতেন, তাঁহাদিগকে আর্য্য বলিত। এ কথা তত্ত্বকরগুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"অনার্য্যৈরার্য্যা ন নম্যন্তে"। অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষু যতই বড় হউন, অন্য ভিক্ষুরা তাঁহাকে কিছুতেই নমস্কার করিতে পারিবে না। নাড় পণ্ডিতের গৃহিণী ছিলেন নিগু, তাঁহার উপাধি ছিল জ্ঞানডাকিনী, তাঁহার আর এক উপাধি ছিল কর্ম্মকরী, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানকাণ্ডে ও কর্ম্মকাণ্ডে উভয়েই পণ্ডিতা ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন বলিয়া নাড় পণ্ডিতের উপাধি ছিল 'আর্য্য'।

নীলকণ্ঠ

ইহাঁর উপাধি আচার্য্য। ইনি কৃষ্ণের বংশধর। ইনি 'অদ্বয়নাড়িকাভাবনাক্রম' নামে এক-খানি বই লিখেন; ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, গুহ্যদ্বার হইতে দুই দিকে দুই নাড়ী উপরে গিয়াছে, একটির নাম রবি, একটির নাম শশী, একটি আলি অর্থাৎ স্বরবর্ণ, আর একটি কালি অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ; তিনি এই দুইটি নাড়ীই যে এক, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। এই যে এক-করা দুই নাড়ী, ইহাই বজ্রসত্ত্বের আসন; কারণ, শাস্ত্রে বলে—"আলিকালি-সমাযোগো বজ্রসত্ত্বস্য বিষ্টরং"।

182 Mb.900.7

মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য*

বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষা সম্বন্ধে আজকাল দেশ জুড়িয়া আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন—বাঙ্গালার মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, উর্দ্দূ। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ভারতের মুসলমানেরা সকলেই এক; সুতরাং তাহাদের মাতৃভাষাও এক। তাঁহারা আরও বলেন যে, অধিক পরিমাণে রাজনীতিক স্বার্থরক্ষার্থ বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের সমস্ত প্রদেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে একতার বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্ত, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মুসলমান অধিবাসিগণের মাতৃভাষা উর্দ্দূ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমরা এ দলের এই যুক্তি-তর্কের যথাযথ উত্তর বহু বার বিভিন্ন উপায়ে দিয়াছি। ভাষা এক না হইলে যদি মুসলমানদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপনের অপর কোন প্রশস্ত পথ না থাকে, তবে পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানের মাতৃভাষা আরবী হওয়া উচিত। পৃথিবীর সকল স্থানের মুসলমানেরা পরস্পর ভাই ভাই—ইহাই কোরাণের শিক্ষা। কিন্তু কোরাণে† অথবা হাদিসে‡ মাতৃভাষা সম্বন্ধে ত কোন আদেশ ও বিধিব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না? ভাষা এক করিয়া কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, আর ভারত ব্যতীত পৃথিবীর অপর স্থানের মুসলমানেরা কি ভাসিয়া যাইবে? তাহার পর আর একটি কথা,—ভারতবর্ষের অপর প্রদেশের মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক। পৃথিবীর সাধারণ নিয়মানুসারে ন্যূনসংখ্যক ব্যক্তিরা সতত অধিকসংখ্যক ব্যক্তিদের সহিত যোগদান করিয়া থাকে। বাঙ্গালার মুসলমানেরা পৃথিবীর এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইবে কেন?—তাহারাই বা আত্মসম্মান ভুলিয়া পরের মাকে মা বলিবে কেন? রাজনীতিক স্বার্থরক্ষা ও একতা বৃদ্ধি অথবা একতা সুদৃঢ় করিবার জন্ত যদি তাঁহাদের হৃদয় ক্রন্দন করে, তবে অল্পসংখ্যক তাঁহারাই কেন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করুন না? অধিকসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানকে কষ্ট না দিয়া যাঁহারা সংখ্যায় অল্প, তাঁহারাই এ কষ্টটুকু স্বীকার করুন না কেন?

আর এক দল বলিতেছেন,—বাঙ্গালী মুসলমানেরা বঙ্গভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সেই জন্ত তাহারা বঙ্গভাষার সেবায় এত উদাসীন। হিন্দুদিগের সহিত একযোগে যখন তাহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহারা বঙ্গ-জননীর সন্তান হইয়াও বঙ্গভাষা-জননীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখার আবশ্যকতা স্বীকার করে না।

---

* নবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত।

† মুসলমানদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস মতে কোরাণ ঈশ্বরের বাক্য।

‡ ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ (দং) যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই হাদিস।

তৃতীয় দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার সেবা ও তাহার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্কিম প্রভৃতি লেখকদিগের তীব্র কষাঘাতে মধ্যপথ হইতে তাহাদিগকে ফিরিতে হইয়াছে। তাই তাহারা হিন্দুদিগের তুলনায় বঙ্গভাষার চর্চ্চায় এত পিছাইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ দল বলিতেছেন,—মুসলমানেরা বঙ্গভাষার অনুশীলনে পূর্ব্বে যেরূপ উদাসীন ছিল, এখন আর তাহাদের মধ্যে সেরূপ ঔদাসীন্য ভাব বর্ত্তমান নাই। তাহারা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনার দিকে ঝুকিয়াছে।

আমার মনে হয়, ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথম দলের উক্তি যে সমর্থনের অযোগ্য, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলের উক্তিও যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মুসলমানদিগের বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিতেছি।

বাঙ্গালী হিন্দু ভ্রাতারা যে হিসাবে ও যে ভাবে এবং যতটা পরিমাণে বাণী-মাতার সেবা করিয়াছেন, বাঙ্গালী মুসলমানেরাও সেই হিসাবে এবং সেই ভাবে প্রায় ততটা পরিমাণে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়াছেন। কেন, কি সাহসে দেশের আধুনিক শিক্ষিত জন-সাধারণের এই সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে এত বড় কথাটা বলিতে সাহসী হইয়াছি, নিম্নে তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় সমান ভাবে সাহিত্যচর্চ্চা ও সাহিত্যালোচনা করিয়াছেন। আমাদের এ কথা যদি সত্য হয়, তবে দেশের আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এরূপ উল্টা ধারণা জন্মিল কেন, প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। অনেক দিন হইতে আমি এ সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিতদিগের মনে এইরূপ ধারণা স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে।—একটিমাত্র কারণে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু এবং আধুনিক শিক্ষিত ও হিন্দুভাবাপন্ন দুই চারি জন মুসলমান, মুসলমানদিগকে "ভাষা-জননীর সেবক নহে" বলিয়া বুঝিবার অবসর পাইয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সেই কারণের উল্লেখ করিতেছি।

অধুনা হিন্দু-ভ্রাতারা আসল বাঙ্গালা ভাষাকে একপ্রকার বর্জ্জন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা এখন বাঙ্গালা ভাষার ভিতর বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দ আনিয়া ফেলিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সমস্ত আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূ শব্দ বঙ্গভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, এখন সেগুলিকে বহিষ্কার করিয়া দিয়া নূতন নূতন সংস্কৃত শব্দ আনিয়া তৎস্থান পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ কার্য্যে যে তাঁহারা কত দূর কৃতকার্য্য হইতেছেন, অথবা কৃতকার্য্য হইবার আশা করিতেছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

মুসলমানেরা বিশেষ কারণবশতঃ বঙ্গভাষার সহিত আরবী, পার্শী এবং উর্দ্দূ শব্দের

ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারেন না ; তাঁহারা আবশ্যকীয় আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূ শব্দকে বর্জ্জন করিয়া মাতৃভাষার আলোচনা ও সেবা করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা ও মাতৃভূমি বঙ্গদেশ হইলেও, তাঁহাদের ধর্ম্মভাষা আরবী এবং পার্শী-উর্দ্দূও কতকটা বটে। সুতরাং আরবী ও পার্শী-উর্দ্দূ ভাষায় বিশেষ ভাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে না পারিলে, ধর্ম্মের বিধি, নিষেধ, ব্যবস্থা ও আদেশগুলি বিশেষ ভাবে অবগত হইয়া তাহা প্রতিপালন করত ধর্ম্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে না কি? সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে আরবী, পার্শীভাষায় আলেম (পণ্ডিত) হওয়া ত সম্ভব নহে? তবে যদি তাঁহারা (বাঙ্গালী মুসলমানেরা) মাতৃভাষায় সমাজের আলেমমণ্ডলীর দ্বারা ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অনুবাদ করাইয়া লন, তাহা হইলে সেই সমস্ত অনূদিত পুস্তকের সাহায্যে তাঁহারা নিজে নিজেই স্বীয় ধর্ম্মব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত হইয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়েন।

কিন্তু মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তন্মধ্যে আরবী, পার্শী শব্দ রাখিতেই হয় এবং কোন কোন স্থলে এমনও আবশ্যক হইয়া পড়ে যে, প্রচলিত দুই চারিটি আরবী, পার্শী শব্দ ব্যতীত অপ্রচলিত আরবী, পার্শী শব্দও ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, আরবী বা পার্শী ভাষার মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এখন নাই এবং ভবিষ্যতেও যে কখনও সৃষ্টি হইতে পারিবে, সেরূপ আশাও নাই। আবার বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সরাসরি ভাবে ধরিয়া লইলে তাহাদিগকে কোন কোন আরবী, পার্শী শব্দের প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে ভাব ও অর্থের অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে দুই একটি মূল শব্দ এবং বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত তাহার প্রতিশব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"আল্লাহ" বলিলে একমাত্র ও নিরাকার খোদাতায়ালাকেই বুঝায়, আর পাঁচটি শব্দ যোগ করিয়া বুঝাইতে হয় না ; কিন্তু ঈশ্বর বা পরমেশ্বর বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না। "রওজা" বলিলে পীর, ওলি ও পয়গম্বরদিগের কবরকেই বুঝায়। সাধারণ মানবের কবরের সহিত "রওজার" আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু গোর বা সমাধি বলিলে কি তাহা বুঝায়? "ইমাম", "পয়গম্বর", "গওস্‌", "কোতব্‌" বলিলে যেমন বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুরুদিগকে বুঝায়, "মহাপুরুষ", "মহাত্মা" বলিলে কি তাহা বুঝিতে পারা যায়? "আলেম," "ওলামা", "মওলানা" বলিলে যাহা বুঝিতে পারা যায়, পণ্ডিত অথবা পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলে কি তাহা বুঝাইয়া থাকে? "আলেম" ও "ওলামা" বলিলে, মুসলমানেরা আরবী ও পার্শীভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং পণ্ডিতমণ্ডলীকেই বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু "পণ্ডিত" ও "পণ্ডিতমণ্ডলী" বলিলে কি আরবী, পার্শীর নামোল্লেখ করিয়া বুঝাইতে হয় না? আবশ্যক হইলে মুসলমানদিগের নিত্যাবশ্যকীয় এরূপ বহু শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত অথবা আবশ্যকীয়

অপ্রচলিত আরবী ও পার্শী শব্দ বঙ্গভাষা হইতে বাদ দিলে কিম্বা আবশ্যক হইলে নূতন শব্দ গ্রহণ না করিলে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের ধর্ম্মালোচনায় বাধা জন্মিবার সম্ভাবনাই অধিক। কেবল তাহাই নহে—আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডার হইতে আবশ্যকীয় নব নব শব্দ গ্রহণ না করিলে, কিছুতেই বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ এবং ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিব না। আমার আরও মনে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়াই এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার কলেবর এরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

বঙ্গভাষা হিন্দুরও যেমন, মুসলমানেরও সেইরূপ। কেবল নাটক, নভেল, উপন্যাস লিখিবার অথবা তাহা পাঠ করিবার জন্যই বঙ্গভাষা অর্থাৎ আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মাতৃভাষা শিক্ষার এবং তাহার আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মাতৃভাষার সাহায্যে ও সহায়তায় সহজে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত হওয়া এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা। কিন্তু বঙ্গভাষার অঙ্গ হইতে যদি আবশ্যকীয় আরবী ও পার্শী শব্দ বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষার অধিকার হইতে বে-দখল করা হইতেছে।

অতঃপর সংস্কৃতভাষার কথা। শুনিতে পাই, সংস্কৃত দেবভাষা। সে ভাষা শিক্ষা ও আলোচনা করিবার অধিকার "ম্লেচ্ছ" মুসলমানদিগের নাই। আজকাল যদিও দুই চারি জন মুসলমান ছাত্র, নানা কারণে স্কুল-কলেজে সংস্কৃত ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের সে শিক্ষা যে "কট-মট" শিক্ষা, প্রকৃতপ্রস্তাবে উত্তমরূপে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করা নানা কারণে যে তাহাদের সাধ্যাতীত, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দ্বিবিধ কারণে, হিন্দুদের সহিত একযোগে মুসলমানেরা বাণীর সেবা করিবার জন্য দলে দলে বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তাই তাহারা জন্মভূমির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিন্দুভ্রাতাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া পড়িয়াছে এবং সেই কারণেই কনিষ্ঠ মুসলমান কিরূপ নীরব সাধনাদ্বারা ভাষা-জননীর চরণ সেবা করিতেছে, তাহা হিন্দুভ্রাতারা দেখিতে পাইতেছেন না।

মুসলমানেরা আরবী, পার্শী ও উর্দ্দূর "মোহ" ধর্ম্মসঙ্গত কারণে ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না এবং বর্ত্তমান সংস্কৃতবহুল বঙ্গভাষায় অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাঁহারা বাণী-মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হন না। তাই তাঁহারা আপনাপন পর্ণকুটীরে বসিয়া আপনাদের শিক্ষা ও শক্তি অনুসারে মাতা বাগ্‌দেবীর সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, আমাদের সেই একনিষ্ঠ সাধক ভ্রাতাদিগের সাধনার কোন সংবাদই রাখি না। তাঁহাদের এই কার্য্যের জন্য উৎসাহপ্রদান এবং ধন্যবাদ করার পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃণা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির।

প্রদর্শন করিয়া থাকি। আমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যজনক ব্যবহার এবং ঘৃণা-ভাবই তাঁহারা তাঁহাদের নীরব সাধনার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কলিকাতায় এবং মফঃস্বলের মুসলমান-পরিচালিত প্রায় ৪০টি ছাপাখানায়, এ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা হইয়া, তাহা বাজারে প্রচার এবং বিক্রয় হইতেছে। কিন্তু আমরা কি তাহার কোন খবর রাখি? শিক্ষিতাভিমানী বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী আমরা, সেই সমস্ত পুস্তকের "বটতলার পুথি" এই নাম দিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছি। "বটতলার পুথি" পাঠ করিবার প্রবৃত্তি হওয়া ত দূরের কথা, নামটি শুনিলেই যেন আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—গায়ে জ্বর আইসে। ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখার ন্যায়, আমরা ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কু-রুচিপূর্ণ ও কু-কথার ভাণ্ডারের ছায়া দেখিতে পাই। তাই "বটতলার পুথি" হাতে লওয়াও মহাপাপ বলিয়া মনে করত ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকি।

যে সমস্ত পুস্তক ("বটতলার পুথি") সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, তন্মধ্য হইতে দুই চারিখানি বাদ দিলে, অবশিষ্ট সকল পুস্তকগুলিই যে পদ্যাকারে লিখিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঐ সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারদিগের কাব্যশক্তি, শব্দযোজনার ক্ষমতা, তাঁহাদের কাব্যে ভাষার লালিত্য, স্বাভাবিকতা ও মৌলিকতা এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান যে, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়; আনন্দে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। এই হতভাগ্য ও অকৃতজ্ঞ দেশে না জন্মিয়া যদি তাঁহারা অপর কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাদের পারলৌকিক আত্মা শান্তিলাভ করিতে পারিত।

হিন্দুভ্রাতাদিগের বাঙ্গালা "রামায়ণ" ও "মহাভারত" যেমন উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, মুসলমান-দিগের "বটতলার পুথি", "আমীর হামজা" এবং "দাস্তান আমীর হামজাও" সেইপ্রকার উচ্চাঙ্গের সাহিত্য। আবার কাব্যের দিক্ দিয়া সমালোচনা করিলে "রামায়ণ" ও "মহাভারত"কে যেমন মহাকাব্য বলা যাইতে পারে, "আমীর হামজা" ও "দাস্তান আমীর হামজা" নামক গ্রন্থ দুইখানিকেও সেইপ্রকার মহাকাব্য বলিলে, কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। "রামায়ণ" ও "মহাভারতের" সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার অপর কোন গ্রন্থ যদি বঙ্গভাষায় থাকে, তবে সে শাহ গরীব-উল্লা ও সৈয়েদ হামজার রচিত "আমীর হাম্‌জা" এবং বালেশ্বরের মৌলবী আব্দুলমজিদ ভুঞা-রচিত "দাস্তান আমীর হামজা"। কিন্তু "দাস্তান আমীর হামজার" ভণিতায় রচয়িতা স্বীয় নাম ব্যবহার না করিয়া, তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নাম ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের নামও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত এবং ইনিই অন্যতম "মুসলমান বৈষ্ণবকবি" কালিদাস। কিন্তু "দাস্তান আমীর হাম্‌জা" গ্রন্থ যে মুন্সী বেলায়েৎ হোসেনের রচিত নহে, এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

গত বৎসর (১৩২২ সাল) বর্দ্ধমান-অষ্টম-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন—

করিয়া, মুসলমান সাহিত্যিকদিগের সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হঠাৎ আমার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং আমি আমার অগ্রজপ্রতিম পরলোকগত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সহিত এতৎসম্বন্ধে পরামর্শ করি। তিনি আমাকে উৎসাহিত না করিলে বোধ হয়, আমি এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিতাম না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেন। এমন কি, তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকার কালে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে, যখন আমি তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, তখনও তিনি এই কার্য্যের জন্য আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহদান করিতে ভুলেন নাই। কিন্তু হায়! আজ তিনি কোথায়? আমার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চিরশান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

যদিও দীর্ঘ এক বৎসর কাল আমি এই অনুসন্ধানের জন্য সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সংসারের নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া, আমি যথানিয়মে এই কার্য্যে সময় ব্যয় করিতে পারি নাই। প্রকৃতপ্রস্তাবে গত পৌষ মাস হইতে আমি এই অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিয়াছিলাম। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এতৎসম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জানিতে পারিয়াছি যে, এ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান কবি, পূর্ব্বকথিত "বটতলার পুথি" নামক ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এখনমাত্র ৪৪৪৬ খানি কাব্য ছাপা হয় ও বাজারে প্রচলিত আছে। ২৯৮২ খানি কাব্যের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়াছে। ৭৯৫ খানি পুস্তক ওয়ারিশদিগের মধ্যে আত্মকলহের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি গ্রন্থের প্রচার সরকার বাহাদুর আইন অনুসারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার তালিকা প্রকাশ করিলাম। যথা,—

১। অভয় দুর্লভ	১২। আদম ও হাওয়া
২। অষ্টখণ্ড	১৩। আকেবত-খায়ের
৩। আশকে রসুল	১৪। আবুশামা
৪। আশকে মোহাম্মাদী	১৫। আসমান সিংহ
৫। আজায়েব চা'র ইয়ার	১৬। আরবা আরবাইন হাদিস
৬। আলাওদ্দিন	১৭। আমীর হামজা
৭। আহমকনামা	১৮। আলেফ লায়লা
৮। আকুল ক্রন্দন	১৯। আহকামল জবেহ
৯। আবেদা বিবি	২০। আহকামল জুমা
১০। আজায়েব সোলেমানী	২১। আখবারল ওজুদ
১১। আহকাম শরিয়ৎ	২২। আম্বিয়ার বাণী

২৩। আদম আশক
২৪। আজায়েবল ওজুদ
২৫। আলী ও দিলবাহার
২৬। আখ্‌বারস্‌ সালাত
২৭। আদম ওজুদতত্ত্ব
২৮। আশকনামা
২৯। আস্‌রারস্‌ সালাত
৩০। আজায়েবল কবর
৩১। আলম স্বামী বাহারজান
৩২। আহকামল মোস্‌লেমিন্‌
৩৩। আহকামল হেদায়েৎ
৩৪। আখ্‌লাকাল আউলিয়া
৩৫। আজকারে তরিকায়ে কাদেরিয়া
৩৬। আহকামল ইস্‌লাম
৩৭। আফতাব দাস্তান
৩৮। আব্দুল্লার হাজার সওয়াল
৩৯। ইউসুফ জেলেখা
৪০। ইব্‌লিসনামা
৪১। ইন্দ্রসভা
৪২। ইমাম যাত্রা
৪৩। ইব্রাহিম আদ্‌হাম
৪৪। ইস্‌লামে দিন
৪৫। ইমাম চুরী
৪৬। ইমামবধ নাটক
৪৭। ইসলামোয়েকা
৪৮। ইস্‌লামিয়া মন্ত্র
৪৯। এস্কে জহুর ও জাহান্‌ আরা
৫০। একদিল শাহ
৫১। এলাজে বাঙ্গালা প্রথম ভাগ
৫২। „ „ দ্বিতীয় ভাগ
৫৩। „ „ তৃতীয় ভাগ
৫৪। এলাজে গাও
৫৫। একশত ত্রিশ ফরজ
৫৬। এসরারল ওজুদ
৫৭। এলাজ-উল্‌ ফোকরা
৫৮। ওমর উর্মিয়ার নকল ও ভোজের বাজী
৫৯। ওমর আলী ইরাবতী
৬০। ওজুদনামা
৬১। ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া
৬২। ওফাতনামা
৬৩। ওসিয়াতুস্‌ সালেহীন
৬৪। কালর নসিহত
৬৫। কওলেল আরেফিন
৬৬। কালু গাজী ও চম্পাবতী
৬৭। কটুর মিঞা
৬৮। কালু গাজী হামিদিয়া
৬৯। কাঞ্চনমালা
৭০। কাসাসোল আম্বিয়া
৭১। কলির চরিত্র
৭২। কালন্নবী
৭৩। কেয়ামতনামা
৭৪। কাশফল মারফত
৭৫। কলি জমানা
৭৬। কলমা মোনাজাত
৭৭। কাশফল এস্‌রার
৭৮। কাজী হয়রান
৭৯। কুঞ্জবিহারী
৮০। কাজীনামা
৮১। কলির বৌ ঘরভাঙ্গানী
৮২। খানে নিয়ামত
৮৩। খাবনামা
৮৪। খায়রে দো-জাহান
৮৫। খোলা সাতল্‌ মসায়েল

৮৬। খোলাসাতয়েকা
৮৭। খোলাসাতল আম্বিয়া
৮৮। খত্‌নামা
৮৯। খোবগল্প ১ম ও ২য় ভাগ
৯০। খোতবা (বাঙ্গালা)
৯১। খোলাসাতল হায়েজ
৯২। খায়ের উল্‌বশর
৯৩। গোলে আরজান্‌
৯৪। গোলে আন্দাম
৯৫। গরকনামা
৯৬। গোলে নওবাহার
৯৭। গোলে বকাওলী
৯৮। গোলে হরমুজ
৯৯। গোলজারে আতশ
১০০। গোল্‌বা বাহরাম
১০১। গোল্‌ সনুবর
১০২। গোল্‌শানে মোহাব্বাত
১০৩। গোল্‌শানে রুম
১০৪। গোলজাদি বিবি
১০৫। গোলশানে আজায়েব
১০৬। গোলে বেখেজান
১০৭। গোল্‌বা সানুওয়ার
১০৮। গোলে নুর রওশন জামাল
১০৯। গাজী কালু চম্পাবতী
১১০। গেন্দে গোল হররোজ
১১১। গঞ্জে মারফত
১১২। গোলজারে ইব্রাহিম
১১৩। গঞ্জের দরিয়া
১১৪। গোল কামরোজ
১১৫। গোলে কোহিনুর
১১৬। গঞ্জে নুর ইস্‌লামেদিন
১১৭। গোলজারে আকরম
১১৮। গাঞ্জল আরস (বাঙ্গালা)
১১৯। গোলে নওনেহার
১২০। ঘুর্ণিনামা
১২১। চৌত্রিশ অক্ষরের কজিলত
১২২। চোরচক্রবর্ত্তী
১২৩। চেমন বাহার
১২৪। চন্দ্রাবলী
১২৫। চাহার দরবেশ
১২৬। চৌদ্দ উজির
১২৭। চন্দ্রাওলি বিশ্বকেতু
১২৮। ছিলচত্র রাজার জঙ্গ
১২৯। ছমছমল মওয়াহেদিন
১৩০। ছমির জালাল
১৩১। জেবল মুলুক শামারোক
১৩২। জঙ্গে হয়দার
১৩৩। জান রওশন
১৩৪। জঙ্গে খয়বর
১৩৫। জুগী কাছের (যোগী কাছের)
১৩৬। জৈগুণ
১৩৭। জামাই শশুরের ঝগড়া
১৩৮। জঙ্গে নওশাদ
১৩৯। জঙ্গে জামাল
১৪০। জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী
১৪১। জঙ্গে বল্‌কান
১৪২। জাহরা বিবির কেস্‌সা
১৪৩। জঙ্গনামা
১৪৪। জঙ্গে সোহরাব
১৪৫। জঙ্গে কারবালা
১৪৬। জাওয়াকল ইমান
১৪৭। জকিনামা
১৪৮। জমজমার কেস্‌সা

১৪৯। জেয়ারতে কবর
১৫০। জঙ্গে হয়দার
১৫১। জোল্‌মাতনামা
১৫২। জরা-সুরা
১৫৩। জেয়ারতে মক্কা
১৫৪। জবেহ্ আহকাম
১৫৫। জোবেদা খাতুন
১৫৬। জামিনী ভান্
১৫৭। জল্‌সা নামা
১৫৮। জমানল ফেরদওস
১৫৯। যোগী কাচ বড়
১৬০। জাদু তেলেস্‌মাত
১৬১। জেয়াফতে আম্
১৬২। ঝগড়ানামা
১৬৩। নুরজাহান
১৬৪। নেকবিবি
১৬৫। নসিহতে করিমী
১৬৬। নুরল বসর
১৬৭। নব চিকিৎসাবোধ
১৬৮। নওখরিদ পাহালওয়ান
১৬৯। নারিকেলবেড়ের লড়াই
১৭০। নিয়েতনামা-হেদায়েৎ উল্ ইসলাম
১৭১। নারীপুরুষ
১৭২। নাজাতোল ইসলাম
১৭৩। নবীন্ মঙ্গল বিষহরা
১৭৪। নসিহতসালাত
১৭৫। নকশে সোলেমানী, প্রথম খণ্ড
১৭৬। " " দ্বিতীয় খণ্ড
১৭৭। " " তৃতীয় খণ্ড
১৭৮। " " চতুর্থ খণ্ড
১৭৯। নদেরচাঁদ কুম্ভীর (!)
১৮০। নেজাম পাগ্‌লা
১৮১। নুরল ইমান
১৮২। নসিহতনামা
১৮৩। নসিহতে জানানা
১৮৪। নুরনামা
১৮৫। নজমন্নিসা
১৮৬। নবী-নামা
১৮৭। নাজাতলওবা
১৮৮। নসিহতন্নেসা
১৮৯। নজ্জুমী কালাম
১৯০। নসিহতল কোস্‌সাক
১৯১। নুর বখ্‌ত নওবাহার
১৯২। নাজাতল আরওয়াহ
১৯৩। নেক বখ্‌ত খসম পিয়ারী
১৯৪। নসিহতে আহলে কলি
১৯৫। নসিহতে ঘোর কলি
১৯৬। নসিহতে আম
১৯৭। নসিহতল ইমান
১৯৮। তকরার দাফে জোল্‌মাত
১৯৯। তিলিস্ সমে হোসরোবা
২০০। তমিমগোলাল
২০১। তক্‌বিয়েতল ইমান
২০২। তিলিসমাত সোলেমানী
২০৩। তালেনামা
২০৪। তুতিনামা
২০৫। তেব্বেনবী
২০৬। তাজকেরাতুল আউলিয়া
২০৭। তাজকিরাতুন্নেসা
২০৮। তাজ-উল্ আলম
২০৯। তম্বিহল্ জাহেলীন
২১০। তফসির বিস্‌মিল্লাহ
২১১। তুষ্টনামা
২১২। তৃষ্ণাবতী বিরাগুরু

২১৩। তোহফাতন্ নসিহত
২১৪। তাজল আলম মাহিগীর
২১৫। তোহফাতল মোস্‌লেমিন্
২১৬। তফসির ফজায়েলে বিস্‌মিল্লাহ
২১৭। তেলাওতল ওজুদ
২১৮। তম্বিয়াতয়েসা
২১৯। তোহফাতল্ মোবতাদী
২২০। তব্‌লিগুল ইসলাম
২২১। তারিখে আবুহানিফা
২২২। দাকাএকল হেকাএক
২২৩। দেলরোবা চারচমন
২২৪। দেলারাম
২২৫। দলিল-উল্ আহকাম
২২৬। দারা সেকান্দারনামা
২২৭। দেলপসন্দ
২২৮। দিনকানা শ্বশুর
২২৯। দেলবাহার গোলেস্তান
২৩০। দেলফেরেব পিয়ারজাহান
২৩১। দিদার ইলাহী
২৩২। দরবেশনামা
২৩৩। দেলদিওয়ানা
২৩৪। দোরয়াতল মোমেনিন
২৩৫। দেলবাহার
২৩৬। দুইসতীনের ঝগড়া
২৩৭। দেলদার কুমার
২৩৮। দেলরওশন হাদিস
২৩৯। দাওয়াতে মোহাম্মাদী
২৪০। দেওনামা তালেনামা
২৪১। দিওয়ান বোরহান
২৪২। দেলখোষ
২৪৩। দালালা মোক্কালা
২৪৪। দুলাদুলহীনের খেলা
২৪৫। দুইশত উপদেশ
২৪৬। প্রেমতরঙ্গ
২৪৭। পদ্মাবতী
২৪৮। পবনকুমারী
২৪৯। পীর গোরাচাঁদ ১ম
২৫০। পীর গোরাচাঁদ ২য়
২৫১। পীর ফরিদ
২৫২। পরিবানু শাহাজাদী
২৫৩। পাকপঞ্জতনের নকৃশা
২৫৪। প্রেমচোরা
২৫৫। ফেসানায়ে আজায়েব
২৫৬। ফাতেমার জহুরানামা
২৫৭। ফজিলাতেহজ্জ
২৫৮। ফজায়েলে হরমায়েন
২৫৯। ফেসানা বেদার বকৃত
২৬০। ফাজিলাতে দরুদ
২৬১। ফুলভোমরা
২৬২। ফতুহশ্বাম, ১ম খণ্ড
২৬৩। ঐ ২য় খণ্ড
২৬৪। ঐ ৩য় খণ্ড
২৬৫। ঐ ৪র্থ খণ্ড
২৬৬। ফতুহল্ এরাক
২৬৭। ফতুহল মেসের
২ ৮। ফকির বিলাস
২৬৯। ফয়সালে আহকাম ২য়
২৭০। ফাজিলাতে বারচান্দ
২৭১। ফজায়েলে সাহরে সিয়াম
২৭২। ফরায়েজ বাঙ্গালা
২৭৩। বাহার দানেশ
২৭৪। বিধবা-বিচ্ছেদ
২৭৫। বিবি জোবেদাখাতুন
২৭৬। বড় তুজিনামা

২৭৭। বে-নজির বদ্‌রেমুনির
২৭৮। বারমাস
২৭৯। বাগ্‌ বাহার
২৮০। ব-কারবালা মাতমহোসেন
২৮১। বে-নমাজী নারী
২৮২। বত্রিশধার লালকুমার
২৮৩। বদিওজ্জমান্‌
২৮৪। বন্‌ বিবির জহুরা
২৮৫। বিশ্বকোশ চন্দ্রাবলী
২৮৬। বেদায়ল গাফেলিন
২৮৭। বাপ-বেটার লড়াই
২৮৮। বে-নমাজীর নসিহত
২৮৯। বেভাষনামা
২৯০। বড়পীর গুণাবলী
২৯১। বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী
২৯২। বেলালনামা
২৯৩। বেহেস্তনামা
২৯৪। ভানুবতীর লড়াই
২৯৫। ভেলুওয়া সুন্দরী
২৯৬। ভূমিকম্প
২৯৭। ভাষানযাত্রা
২৯৮। মধুমালা
২৯৯। মৌলুদ বাহারিয়া
৩০০। মৌলুদ গোলজারে বাহারিয়া
৩০১। মৌলুদ গোলজারে আকরম
৩০২। মৌলুদ আহয়াল কুলুব
৩০৩। মৌলুদ তওয়াল্লাদনামা
৩০৪। মৌলুদ জিন্নাতলবাগ
৩০৫। মৌলুদ গোলশানে-বাহার
৩০৬। মৌলুদ মোস্তাফা
৩০৭। মৌলুদ গোলশানে আরব
৩০৮। মৌতনামা
৩০৯। মফিদল ইসলাম
৩১০। মফিদল হোজ্জাজ
৩১১। মল্লিকার হাজার সওয়াল
৩১২। মফিহুল খালায়েক
৩১৩। মালকা জোহরা
৩১৪। মোনাইযাত্রা
৩১৫। মোকসুদ-উল্‌ মোহসেনিন
৩১৬। মেপ্তাহল জিন্নাত
৩১৭। মল্লিকা আকার
৩১৮। মনোরায় জাহানারা
৩১৯। মালতীকুসুমমালা
৩২০। মালঞ্চকন্যা
৩২১। মোবারক গাজীশাহ
৩২২। মেপ্তাহল ইসলাম
৩২৩। মারফতেজঙ্গ
৩২৪। মস্‌নবী
৩২৫। মাদায়েনল ওলুম
৩২৬। মোহব্বাতে গুলশান
৩২৭। মাহতাববালা
৩২৮। মানিকপীর
৩২৯। মাজারে ফেরদওস
৩৩০। মনসুরহাল্লাজ
৩৩১। মফিদল মোমেনিন
৩৩২। মজমুওয়া মোনাজাত
৩৩৩। মারফতেহক্কানী
৩৩৪। মসায়েলে মউতা
৩৩৫। মারফতনামা
৩৩৬। মারফতে মওলা
৩৩৭। মেয়ারাজনামা
৩৩৮। মেসবাহল ইসলাম
৩৩৯। মোহাম্মাদী বেদ ১ম খণ্ড
৩৪০। ঐ ২য় খণ্ড

৩৪১। মুর্শিদনামা
৩৪২। মোহসেন্-উল্ ইসলাম
৩৪৩। মোনহরমালতী
৩৪৪। মাহেরমজানের কেস্‌সা
৩৪৫। মোহরে সোলেমানী
৩৪৬। মোনাব্বেহাত তাম্বিহলজাহেলিন
৩৪৭। রাতকানা জামাই
৩৪৮। রাজকন্যা মধুমালা
৩৪৯। রঙ্গিনবাহার কলির অবতার
৩৫০। রঙ্গবাহার
৩৫১। রাঁড়ের মকর, ১ম ভাগ
৩৫২। ঐ ২য় ভাগ
৩৫৩। রসনেসা-কন্যা
৩৫৪। রংবেলাস রঙ্গিনী
৩৫৫। রহমতেহক
৩৫৬। রৌশনল মোমিনীন
৩৫৭। রূপবান্-রূপবতী
৩৫৮। রাগমালা শতময়না
৩৫৯। রেজওয়ানসাহা
৩৬০। রাহেনাজাত
৩৬১। রওশনল ইমান
৩৬২। রোকমনিপরি
৩৬৩। রসের খনি
৩৬৪। লালবানু শাহাজামাল
৩৬৫। লালমতি সয়ফলমুল্লুক
৩৬৬। লাইলীমজনু
৩৬৭। লালমিঞা শিবতারা
৩৬৮। লালমোন
৩৬৯। লজ্জাবতী
৩৭০। লজ্জতন্নেসা
৩৭১। লালকুমার ভানুবতী
৩৭২। লক্ষ্মী-শনির ঝগড়া
৩৭৩। লোকমান হাকিমের উপদেশ
৩৭৪। সয়ফলমুল্লুক (বড়)
৩৭৫। সয়ফলমুল্লুক (ছোট)
৩৭৬। সোলতান্ জমজমা
৩৭৭। সুরতলাল বিবি
৩৭৮। সেকান্দারনামা
৩৭৯। সায়েতনামা
৩৮০। সাথাওয়াংনামা
৩৮১। সেরাজ-উল্ ইসলাম
৩৮২। সালাতেনুর
৩৮৩। সোলেমানী তালেনামা
৩৮৪। সুরতজামাল
৩৮৫। সুরতনামা
৩৮৬। সেরাজলমোমেনিন
৩৮৭। সিদ্দিকল্‌ওয়ায়েজিন
৩৮৮। সত্যপীর
৩৮৯। সোলতানবল্‌খী
৩৯০। সোণাভান
৩৯১। সূর্য্যউজাল
৩৯২। সমুত্তভান
৩৯৩। সখিসোণা
৩৯৪। স্বাশুড়ী বৌ'র ঝগড়া
৩৯৫। সতীবিবি
৩৯৬। সহীদে কারবালা
৩৯৭। সের আলী
৩৯৮। সাদ্দাদেব নকল বেহেস্ত
৩৯৯। সুন্দরকন্বল বারমাসী
৪০০। সংসারচরিত্র
৪০১। সতীময়নাপ্রকাশ সৈয়দ ময়না
৪০২। সপ্তপয়কর
৪০৩। সাপের মন্ত্র
৪০৪। শাহীতখ্তে সোলেমানী

৪০৫। শরাহবেকায়া
৪০৬। শশীমুক্তা
৪০৭। শাহ এব্রাণ চন্দ্রবান
৪০৮। শেখ ফরিদ
৪০৯। শাহাদাৎনামা
৪১০। শাহমাদারের কেস্সা
৪১১। শাহরুম
৪১২। শিরিফরহাদ
৪১৩। শাহ জ্বালাল জমিলাখাতুন
৪১৪। শাহ ঠাকুরবর
৪১৫। শাহকামাল সূর্য্যভানু
৪১৬। শাহদোলা
৪১৭। শাফাতুলবালা
৪১৮। শাহকলন্দর
৪১৯। শ্যামসোহাগীর কেস্সা
৪২০। শ্যামসুন্দর পরিমালা
৪২১। শামছরিমান
৪২২। শীতবসন্ত
৪২৩। শাহনামা
৪২৪। শাহসুফি সোল্‌তান
৪২৫। শামসুল আহকার
৪২৬। শরাহমোহাম্মাদী
৪২৭। হদ্দ মজার শ্বশুরবাড়ী
৪২৮। হয়রাতালফেকা
৪২৯। হুজ্জতল ইসলাম
৪৩০। হায়জানামা
৪৩১। হেদায়েতুলইসলাম (বাঙ্গালা)
৪৩২। হাসেল মকসুদ
৪৩৩। হুরমুরবিবির কেস্সা
৪৩৪। হায়েজনেফাস
৪৩৫। হাতেমতাই
৪৩৬। হাকিকতল আম্বিয়া
৪৩৭। হাজার মসলা
৪৩৮। হাদিস আরবাইন
৪৩৯। হায় বাতুল মোমিনীস
৪৪০। হেদায়েতুল মোবতাদী
৪৪১। হেদায়েতুল ফোস্সাক
৪৪২। হাবিল কাবিলের কেস্সা
৪৪৩। হাদিস দেলরওশন
৪৪৪। হকিকতস্ সালাত
৪৪৫। হালাতন্নবী
৪৪৬। হাসেন হোসেন
৪৪৭। হাসিনাবানু
৪৪৮। হেকায়েত চারইয়ার
৪৪৯। হৃদয়ের প্রেম-লহরী
৪৫০। হপ্ত আকৃলিমের বাদশাহ

"বটতলার পুথি" বলিয়া আমরা যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করি না, কেবল ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি, উপরের তালিকায় সেই শ্রেণীর ৪৫০ খানি পুস্তকের নাম লিখিত হইল। বাজারে প্রচলিত ৪৪৪৬ খানি "বটতলার পুথির" মধ্যে, এ পর্য্যন্ত ৪৫০ খানি পুস্তকই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। ইহার মধ্যে যে কয়েকখানি পুস্তকের রচয়িতার নাম, ঠিকানা এবং রচনার সাল নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

অভয়তুর্ল্ভ—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুচিয়ামোড়া গ্রামনিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা কর্ত্তৃক বিরচিত।

আখ্‌বার-উল্‌ওজুদ—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্সী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আম্বিয়ার বাণী—১১৬৫ সালে রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট ঝাড়বিশিলা গ্রামনিবাসী কাজী হায়াতমোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

আখ্‌বারস্‌ সালাত—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

আস্‌রারস্‌সালাত—১২৯৬ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্‌শী আব্দ‌ুল ওহ্বাব এই পুস্তক রচনা করেন।

আরবা-আরবাইন হাদিস—১৩০৯সালে এই পুস্তক হাজী গরিবউল্লাদ্বারা বিরচিত।

আবুসামা—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলা নিবাসী জয়নাল আবেদিন কর্ত্তৃক এই পুস্তিকা বিরচিত।

আজায়েব সোলেমানী—১৩০৫ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

আলাওদ্দিন—১৩০৮ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিয়ত আলী দ্বারা এই পুস্তক বিরচিত।

আহকামল শরিয়ত—১২৮৮ সালে আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

আজায়েব চা'র ইয়ার—১২০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার ফেলু ওস্তাগার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইব্‌লিসনামা—১১৭৮ সালে মুন্‌শী শাহ গরিবুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

আস্‌মানসিং—১৩০১ সালে বরিশাল জেলার সলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ইমামচুরী—১২৫০ সালে বক্তার খাঁ কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত।

ইমামযাত্রা—১৩০৯ সালে বগুড়া জেলার গৈনারীকান্দি নিবাসী দুর্গতীয়া সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ইউসুফ জেলেখা—১২৪০ সালে ফকির মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

একশত ত্রিশ ফরজ—১২৪৬ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

এলাজে বাঙ্গালা—১২৯৮ সালে নদীয়া জেলার শান্তিপুরনিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক্‌ এই পুস্তক রচনা করেন। ইহা তিন খণ্ডে সমাপ্ত।

এশ্‌কে জহর—১৩২২ সালে ফরিদপুর জেলার সুন্দরদিনিবাসী আব্দ‌ুল হাকিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "এশ্‌কে জহর বা জাহান্‌ আয়ার কেস্‌সা"।

একদিলশাহ—১২৪১ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ী নিবাসী আশক মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পীর গোরাচাঁদ—১২৭৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার খেজুরহাটী-বাহাদুরপুরনিবাসী খোদা-নওয়াজ সাহেব এই পুস্তক রচনা করেন।

Imp 4231 dt- 18/7/07 RAR■ ■

তব্‌লিগ-উল্‌ ইসলাম—১৩১৫ সালে হুগলী জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামনিবাসী মোহাম্মাদ দাউদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "তব্‌লিগ-উল্‌ ইসলাম অর্থাৎ তোহফাতুল মোমেনিন।"

তারিখে-আবুহানিফা—১৩১৮ সালে চট্টগ্রাম জেলানিবাসী মৌলবী ইয়ার মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

দরবেশনামা—১২৬৭ সালে ফরিদপুর জেলার মুল্‌ফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জেমারফৎ—১২৬৮ সালে ফরিদপুর জেলার মুলফৎগঞ্জনিবাসী মৌলবী আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

শশীমুক্তা—১৩১১ সালে বরিশাল জেলার জয়ানিবাসী আফতাবউদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দিল্‌দিওয়ানা—১২৬৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা-হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

শহীদেকারবালা—১২৮৯ সালে হুগলী জেলার ভুরশুট-কানুপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরআলী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ সেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরলইমান—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

নক্‌শে সোলেমানী—এই পুস্তক চারি খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম খণ্ড ১২৬৮, ২য় খণ্ড ১২৬৯, ৩য় খণ্ড ১২৭০ এবং ৪র্থ খণ্ড ১২৭১ সালে বিরচিত হয়। হুগলী জেলার ধসানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

নেজাম পাগ্‌লা—১১৭৩ সালে মুন্‌শী মোহাম্মাদ এই গ্রন্থ রচনা করেন।

নুরনামা—১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার বান্ধবপুরনিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

ঝগড়ানামা—১২৭২ সালে ২৪ পরগণা জেলার ধান্যখোলা মোহনপুরনিবাসী আসিরদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ওজুদনামা—১৩০৩ সালে কলিকাতানিবাসী আব্দুল অহ্‌হাব এই পুস্তক রচনা করেন।

কল্‌মা মোনাজাত—ঢাকা জেলার মফিজদ্দিন আহমদ্‌ গত ১২৯৮ সালে এই পুস্তক রচনা করেন।

চৌদ্দ উজির—১৩০৩ সালে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ানিবাসী মোহাম্মাদ ওমর এই পুস্তক রচনা করেন।

গমের দরিয়া—১২৯০ সালে ঢাকা জেলার শরাফৎগঞ্জনিবাসী আব্দর রহমান এই পুস্তক রচনা করেন।

চাহার দরবেশ—বিগত ১১৭৮ সালে মুন্শী মোহাম্মাদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

কেয়ামতনামা—১২৪১ সালে ২৪ পরগণার বসিরহাটনিবাসী উর্দ্দূ হেদায়েৎ ইস্‌লাম রচয়িতা, হাফেজ সৈয়েদ আমানত-উল্লা সাহেব এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সায়েতনামা—১২৯২ সালে ঢাকা জেলার মুন্শী মফিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গেসোহরাব—১২৯৪ সালে ২৪ পরগণার হায়দারপুর গ্রামনিবাসী হবিব-উল-হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলেমানী তালেনামা—১২৯৮ সালে গোলাম ফরিদ নামক এক ব্যক্তি এই পুস্তক রচনা করেন।

নাজাতুল আরওয়াহ—১৩১০ সালে কলিকাতানিবাসী মুন্শী আব্দুল ওহাব এই পুস্তক রচনা করেন।

গেন্দেগোলহরয়োজ—১২৮৪ সালে হুগলী জেলানিবাসী মোহাম্মাদ তাহের এই পুস্তক রচনা করেন।

তুষ্টনামা—১২৮৬ সালে শ্রীরত্নেশ্বর দাস এই পুস্তক রচনা করেন।

বেদারল গাফেলিন—১২৬৮ সালে হুগলী জেলার বালিয়া বামনপাড়ানিবাসী সমির-উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফয়সালে আহকাম—১৩১০ বঙ্গাব্দে হুগলী জেলার মোহাম্মাদ মুন্শী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফজিলাতে বারচাঁদ—১২৯৩ সালে হুগলী জেলার ধনানিবাসী জোনাব আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফকিরবিলাস—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার শীতলগাড়ীনিবাসী মুন্শী এনায়েতুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাজার মসলা—১১৭৬ সালে মোহাম্মাদ জান এই পুস্তক রচনা করেন।

দিদার ইলাহী—১২৭২ সালে বর্দ্ধমান জেলার গোলাম ইমাম ওরফে বুদ্ধুশাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

সপ্ত পয়কার—১১৬০ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

সতী ময়না—১১৪১ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত কাজী দৌলত ও পণ্ডিত সৈয়েদ আলাওল এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "সতী ময়না, প্রকাশ সৈয়েদ ময়না ওরফে লোরচন্দ্রানী।"

খায়রে দো জাহান্—১২৮৬ সালে যশোহর জেলার মুন্‌শী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্‌ বা সানুওয়ার—১২৯০ সালে হাওড়া জেলার মোল্লা মোহাম্মদ দানেশ এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহে এব্রাণ চন্দ্রবান্—১২৮৭ সালে মুন্‌শী মোহাম্মদ দ্বারা বিরচিত।

মনসুরহাল্লাজ—১২৮২ সালে ২৪ পরগণা জেলার শেখ আমির উদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

শেখ ফরিদ—১২৯৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার গলাচিপা হোসেনপুরনিবাসী আব্দর রহিম এই পুস্তক রচনা করেন।

নসিহাতে আহলেকেলি—১৩১৫ সালে হাওড়া জেলার আদমপুরনিবাসী মোহাম্মদ আইনদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

তুতিনামা—১২৯৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

নূরবখ্‌ত নওবাহার—১২৮৮ সালে হাওড়া জেলার চন্দ্রপুরনিবাসী শেখ আব্দল-গফ্‌ফার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাতেমতাই—১৩১০ সালে হাওড়া জেলার বসন্তপুরনিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

সেরাতল মোমেনিন—১২৯৬ সালে মুন্‌শী মালেমোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

তৃষ্ণাবতী বিরাগুরু—১২৬৭ সালে যশোহর জেলার মধুভোগনিবাসী মুন্‌শী মণিরদ্দিন্ এই পুস্তক রচনা করেন।

কাসাসোল আম্বিয়া—১৩০২ সালে কলিকাতানিবাসী মৌলবী রহমতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গনামা—১৩০১ সালে মুন্‌শী মোহাম্মদ ইয়াকুব এই পুস্তক রচনা করেন।

বোন্‌বিবির জহুরানামা—১২৮৭ সালে হাওড়া জেলার মুন্‌শী মোহাম্মদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশালে আজায়েব—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার মণ্ডলঘাটনিবাসী শাহাদাৎ-উল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

দিলফেরের পিয়ারজাহান—১২৯১ সালে হাওড়া গোলাবাড়ীনিবাসী সৈয়েদ মোহাম্মদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

সতীবিবির কেস্‌সা—১৩০৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালঞ্চকন্যা—১৩০৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্‌বাহার গোলেস্তা—১৩০০ সালে ২৪ পরগণা জেলার কোমরদ্দিন কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত হয়।

জহুরা বিবির কেস্‌সা—১২৮১ সালে ঢাকা জেলার গড়পাড়া নিবাসী মুন্‌শী তাজদ্দিন মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

মালতীকুসুমমালা—১৩০২ সালে মোহাম্মদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

দিন্‌কাণা শ্বশুর—১৩১১ সালে ২৪ পরগণার তালপুকুরনিবাসী আয়জদ্দিন আহম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

সমির জ্বালাল—১৩২০ সালে ঢাকা জেলার কোমরদ্দিন খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

চন্দ্রাবলী—১২৮১ সালে ফরিদপুর জেলার মোহাম্মাদ আবেদ এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্বাশুড়ী বৌর ঝগড়া—১৩১০ সালে ২৪ পরগণানিবাসী মোহাম্মাদ মাহমুদ এই পুস্তক রচনা করেন।

নারীপুরুষের রঙ্গ রসের ঝগড়া—১২৮২ সালে রাজসাহী জেলার জোবেদ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে চল্‌কান্‌—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম মীরেশ্বরী নিবাসী শেখ আব্দুল আজিজ এই পুস্তক রচনা করেন।

বদিওজ্জমার লড়াই—১৩১৮ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

কলির চরিত্র—১৩১৯ সালে চট্টগ্রাম জেলার বামনসুন্দর ভরদ্বাজহাটনিবাসী হাফেজ হাশমত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার গোবিন্দপুর নিবাসী (আসল) মুন্‌শী মোহাম্মাদ খাতের এই গ্রন্থ রচনা করেন।

সূর্য্য উজ্জাল—১২৪৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার বক্তার খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্‌বা বাহরাম—১২৮৪ সালে মোহরদ্দিন মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

পবনকুমারী—১২৯৫ সালে নদীয়া জেলা নিবাসী খোন্দকার গোলাম ইস্‌মাইল এই পুস্তক রচনা করেন।

রসনেসা কন্যা—১৩০৬ সালে বরিশাল জেলার শৈলাদা নিবাসী মোকাম্মেল খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

সোনাভান—১১৫৫ সালে ২৪ পরগণা নিবাসী ফকির মোহাম্মদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লালমোন্—১১১১ সালে মোহাম্মাদ আরিফ এই পুস্তক রচনা করেন।

সামৃতভান্—১২৯৬ সালে হাবিলদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

হুরনূর বিবি—১৩০৬ সালে মেদিনীপুর জেলার হোসেনাবাদ নিবাসী দেরাজতুল্লা ওরফে আব্দুল সাত্তার এই পুস্তক রচনা করেন।

জামাই শ্বশুরের ঝগড়া—১৩১০ সালে আসগার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শামসোহাগীর কেস্‌সা—১৩২১ সালে রাজসাহীর বাহাদুরপুরনিবাসী মোহাম্মাদ মফির উদ্দিন ও মফিজ উদ্দিন আহমদদ্বয় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলশানে মোহাব্বাত—১২৮৬ সালে মুনশী তমিজ উদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

গোলশানে রুম—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণার মেটিয়া-বুরুজ নিবাসী আব্দুল জব্বার এই পুস্তক রচনা করেন।

শাম নূরিমান—১২৯০ সালে ২৪ পরগণার মুন্শী মোহাম্মাদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্ সনুবর—(গদ্য) ১২৯০ সালে ২৪ পরগণার শ্রীকানাইলাল শীল এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে নওশাদ—১৩১৯ সালে মেদিনীপুর জেলার মস্তানিবাসী সুবেদার আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

যামিনী ভান্—১২৯৮ সালে হাওড়া জেলার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

শ্যামসুন্দর পরিমালা—১৩১৯ সালে রংপুর জেলার মোহাম্মাদ ইদ্রিস এই পুস্তক রচনা করেন।

মল্লিকা আকার—১২৭২ সালে আমিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোল্‌জাদী বিবি—১৩২০ সালে জলপাইগুড়ির হায়হায়পাথারনিবাসী তমিজদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

লজ্জাবতীর পুথি—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার হাত-হেড়ে নিবাসী আজহার আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্ পসন্দ—১২৯৯ সালে হুগলী তালপুরনিবাসী আয়জদ্দিন কর্ত্তৃক বিরচিত।

শীতবসন্ত—১৩২০ সালে গোলাম কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতজামাল—১৩১৬ সালে হাওড়া জেলার খয়রুল্লা মোহাম্মাদ ও জোনাব আলী কর্ত্তৃক বিরচিত।

মনোরায় জাহান্ আরা—১৩১৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার চাঁদগাঁওনিবাসী মোহাম্মাদ আব্বাস আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাশুড়ীজামাই'র ঝগড়া—১৩২১ সালে ঢাকার চাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী কর্ত্তৃক বিরচিত।

সখীসোণা—১৩১৮ সালে ঢাকার ঢাকিজোড়নিবাসী মোহাম্মাদ কোরবান আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বত্রিশধার লালকুমার—১৩১৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলার হায়হায়পাথার নিবাসী ইদ্রিস মোহাম্মাদ কর্তৃক বিরচিত।

জঙ্গে জামাল—১৩২১ সালে হাওড়া জেলার খল্‌সানীনিবাসী মৌলবী শেখ আজহার এই পুস্তক রচনা করেন।

সুরতলাল বিবি—১৩২০ সালে ২৪ পরগণা জেলার হাতিয়াগড়নিবাসী মোহাম্মাদ বাবন এই পুস্তক রচনা করেন।

জঙ্গে রসুল—১৩২০ সালে হাওড়া জেলার খল্‌সানিনিবাসী মৌলবী আজহার আলী কর্তৃক বিরচিত। এই পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "জঙ্গে রসুল ও জঙ্গে হজরত আলী"।

সমুসামল মোয়াহেদিন—১২৯৪ সালে নদীয়া জেলার বড় চাঁদঘরনিবাসী ফসিহদ্দিন কর্তৃক বিরচিত।

রাশিনামা—১২৯৬ সালে এই "রাশিনামা, তালেনামা ও চিকিৎসারত্নাবলী" নামক পুস্তক কুমিল্লা জেলার মুনশী ফয়জদ্দিন রচনা করেন।

লালমিঞা শিবতারা—১৩১২ সালে নোয়াখালী জেলার নলপুরনিবাসী মুনশী আব্দুল কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

শাফাতোলবালা—১২৯৯ সালে দিনাজপুর জেলার জগন্নাথপুরনিবাসী হাজী ছাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহাদোলা—১৩১০ সালে মোহাম্মাদ আকবর আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকামাল সূর্য্যভানু—১২৯০ সালে ময়মনসিংহ জেলানিবাসী আব্দুল গণী এই "শাহকামাল সূর্য্যভানু বিবি" নামক পুস্তক রচনা করেন।

শাহঠাকুরব—১৩১০ সালে ২৪ পরগণার ডাউকী নিবাসী নসিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

সোলতান বল্‌খী—১২৮৬ সালে আব্দুল মজিদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

হাসেল মকসুদ—১২৯০ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

হেদায়েৎ ইসলাম—১২৯৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুনশী গোলাম মওলা, এই পুস্তকের দ্বারা বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের সুবিধার জন্য, উর্দ্দূ-ভাষায় লিখিত মূল "হেদায়েৎ-উল্‌ ইসলামের" বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।

হায়জানামা—১২৯২ সালে ২৪ পরগণা জেলার খাসপুরনিবাসী মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক বঙ্গভাষায় রচনা ও প্রকাশ করেন।

হুজ্জতল ইস্‌লাম—১২৯৯ সালে হুগলী জেলার বালড়নিবাসী রহিম বক্‌শ এই পুস্তক রচনা করেন।

কাঞ্চনমালা—১২৯৩ সালে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণচান্দলানিবাসী সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

শাহকলন্দর—১২৮৬ সালে বগুড়া জেলার শাহমামুদ খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

ঘৃণিনামা—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার কুঁচিয়ামোড়া গ্রাম নিবাসী ওসিমদ্দিন শাহা এই পুস্তক রচনা করেন।

মোনাই যাত্রা—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার নাজের মোহাম্মাদ সরকার এই পুস্তক রচনা করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহার সংশোধন করেন। পুস্তকের ভণিতায় উভয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মালকা জোহরা-বিবি—১২৯৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

প্রেমতরঙ্গ—১২৮৩ সালে চট্টগ্রাম জেলার মোশায়টক নিবাসী মুন্‌শী মোহাম্মাদ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর উম্মিয়ার নকল—১৩০০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

কটুর মিঞা—১২৯৪ সালে কুমিল্লা জেলার সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

কালুগাজী ও চম্পাবতী—১২৮৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার খোন্দকার আহমদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

কওলেল আরেফিন—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণা জেলার শাহ শেরআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

খানে নিয়ামত—১২৯২ সালে বর্দ্ধমান জেলার বামনিয়া নিবাসী মুনশী গোলাম মওলা ওরফে ফেলু মুন্‌শী এই পুস্তক রচনা করেন।

উম্মর আলী ইরাবতী—১৩১৯ সালে ২৪ পরগণা জেলার ওসিমদ্দিন শাহ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

নূরল্‌ বসর—১২৯৭ সালে পাবনার সাহাজাদপুরনিবাসী আব্দুল শুকুর ওরফে মাণিক মিঞা এই পুস্তক রচনা করেন।

নসিহতে করিমী—১৩০০ সালে ফরিদপুর জেলার চর-শিমুলিয়া নিবাসী ও মক্কা-প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

গঞ্জল আরশ—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুন্‌শী গোলাম মওলা এই পুস্তক আরবী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।

শাহজলাল জমিলা খাতুন—১২৯৯ সালে কুমিল্লা জেলার বকশ আলী খোন্দকার এই পুস্তক রচনা করেন।

মফিদল হোজ্জাজ—১৩০০ সালে দিনাজপুর জেলার যোগীবাড়ী নিবাসী হাজী হেদায়েৎউল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

তেলেস্‌মাত সোলেমানী—১২৯৮ সালে কুমিল্লা জেলার হাফেজ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জম আলী এই পুস্তক রচনা করেন। ইহার অপর একটি নাম "আজারের সোলেমানী দ্বিতীয় ভাগ"।

ভানুবতীর লড়াই—১৩০১ সালে বগুড়া জেলার খলিল উদ্দিন গাইন এই পুস্তক রচনা করেন।

ব-কারবালা মাতম হোসেন—১২৯৬ সালে মেদিনীপুর জেলার মৌলবী আব্দুল-কাদের এই পুস্তক রচনা করেন।

বাগবাহার—১৩০২ সালে কুমিল্লা জেলা নিবাসী সৈয়েদ জিন্নাত আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

ভেলুওয়া সুন্দরী—১২৮৪ সালে চট্টগ্রামনিবাসী ও কলিকাতা প্রবাসী মৌলবী হামিদুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

লালবানু শাহজামাল—১৩০০ সালে রঙ্গপুর জেলার সাদেক আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

বাহার দানেশ—১৩০২ সালে শ্রীদ্বারিকানাথ রায় এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলেআরজান—১২৮২ সালে কাজী রয়হান্-উদ্দীন আহমদ্ ও সাদুল্লা সরকার এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তক পাঠ করিলে, গ্রন্থকারদ্বয়কে বগুড়া জেলার লোক বলিয়া বোধ হয়।

জঙ্গে হয়দার—১৩২২ সালে মুনশী কোবাদ আলী এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শাহআলম নুরজাহান—১২৯১ সালে শেখ মেহেরুদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তুতিনামা—১২৮২ সালে হাওড়া জেলার মুনশী মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

রাজকন্যা মধুমালা—১৩০৭ সালে ময়মনসিংহ নিবাসী সৈয়েদ জোবেদআলী এই পুস্তক রচনা করেন।

রাতকাণা জামাই—১৩১৫ সালে মোহাম্মাদ দেরাছতুল্লা এই পুস্তক রচনা করেন।

জোবেদা খাতুন—১২৯২ সালে হুগলী জেলার মুনশী জোনাব আলী ইহার রচনা করেন।

শিরিঁ ফরহাদ—১২৮৫ সালে হুগলী জেলার কাজী রয়হানউদ্দিন আহমদ ও তমিজদ্দিন খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলআন্দাম—১২৯০ সালে হুগলী জেলার হরিপালনিবাসী মুনশী আয়জদ্দিন দ্বারা বিরচিত।

হুদ্দমজ্জার শ্বশুরবাড়ী—১৩১৭ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ মুনশী এই পুস্তক রচনা করেন।

বেনজীর বদ্‌রেমুণির—১২৭৯ সালে হাওড়া জেলার করিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করেন।

খয়বরের জঙ্গনামা—১২৮৪ সালে দিনাজপুর জেলার মৌলবী দোস্তমোহাম্মাদ চৌধুরী এই পুস্তক রচনা করেন।

মেফতাহল লেন্নাত—১২৮০ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মাদ খাতের এই পুস্তক রচনা করেন।

মকসুদল্ মোহসিনিন—১২৯৯ সালে রংপুর জেলার জলঢাকানিবাসী মৌলবী জহিরদ্দিন আহমদ এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা বেদার বখ্ত—১৩১৪ সালে ফরিদপুর জেলার পালংনিবাসী কাজী আব্দুল ওয়াজেদ এই পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম "ফেসানা বেদার বখ্ত ও পরিমাহেলাকা"।

জৈগুণ—১২০৪ সালে হুগলী জেলার ভুরশুট নিবাসী সৈয়েদ হামজা এই পুস্তক রচনা করেন।

দারা সেকান্দারনামা—১১৯৫ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত এই পুস্তক রচনা করেন।

গোলজারে আতশ—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী আব্দুল্লাহ এই পুস্তক রচনা করেন।

দলিল উলআহকাম—১২৯৫ সালে ফরিদপুর জেলার বহুরা কোটালীপাড়ানিবাসী মৌলবী দলিলউদ্দিন আহম্মদ দ্বারা বিরচিত।

পদ্মাবতী—এই পুস্তকের রচনার সাল তারিখ আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। চট্টগ্রামের সৈয়দ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশকের যে নামের মোহর পুস্তকে ছাপা হইয়াছে, তাহাতে ১২৮৭ সাল লেখা আছে।

হয়রাতাল ফেকা—১২৭৬ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলামমওলা এই পুস্তক রচনা করেন।

নিয়েতনামা—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎহোসেন, ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত "হেদায়েৎ-উল্ ইসলাম" নামক উর্দ্দু পুস্তক অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিয়াছেন।

মল্লিকার হাজার সওয়াল—১২৭৬ সালে মুনশী শেরবাজ এই পুস্তক রচনা করেন।

নারিকেল বেড়ের লড়াই—১২৩৫ সালে ২৪ পরগণা জেলার সাজনগাজী এই পুস্তক রচনা করেন।

ফেসানা-আজায়েব—১২৭৫ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী বেলায়েৎ হোসেন এই পুস্তক রচনা করেন।

ফজায়েলে হরমায়েল—১২৮৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার আদিম নিবাস ফরিদপুর জেলায়।

ফজিলাতে হজ্জ—১২৯৩ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

ফাতেমার জহুরানামা—১৩০০ সালে বগুড়া নিবাসী আসমতুল্লা খোন্দাকার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

বে-নমাজী নারীর পুঁথি—১৩০০ সালে কুমিল্লা রাজগঞ্জ নিবাসী কলিমদ্দিন এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

মফিদল খালায়েক—১২৯০ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম এই পুস্তক রচনা করেন।

যুগী কাছের—১২৩৪ সালে বগুড়া নিবাসী সাহেবুল্লা খাঁ এই পুস্তক রচনা করেন।

রং বাহার—১২৭১ সালে কটকনিবাসী মৌলবী হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

তকৃবিয়েতুল ইমান—১২৭০ সালে ২৪ পরগণা জেলার বাইশহাট্টা-খুলিহারী নিবাসী উমেদ আলী এই পুস্তক রচনা করেন।

দেল্রোবা টার চমন্—১১৯৯ সালে কটকের মৌলবী ও হাজী আব্দুল মজিদ ভূঞা ইহা রচনা করেন।

রঙ্গিন বাহার—১২৮৮ সালে বগুড়া জেলার কুজাইল নিবাসী মোহাম্মাদ আরিফ ইহা রচনা করেন।

খাব্নামা—১৩০৭ সালে ২৪ পরগণা জেলার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

গোলে বকাওলি—১৩০০ সালে পাবনা জেলার দুলাই নিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ওরফে মাণিক মিঞা ইহা রচনা করেন।

গোলশানে নওবাহার—১৩০৪ সালে পাবনা জেলার দুলাইনিবাসী মুনশী আব্দুল শুকুর ইহা রচনা করেন।

গারুকৃনামা—১২৮৩ সালে বরিশাল ভোলা মহকুমার আলিনগর নিবাসী শেখ মেনুহা-জদ্দিন ইহা রচনা করেন।

চোরচক্রবর্ত্তী—১২৮৬ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

চৌত্রিশ অক্ষর—১৩০০ সালে রংপুর জেলার মেলাবর সাকিনের রসুলমোহাম্মদ খোন্দকার ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম "চৌত্রিশ অক্ষরের ফজিলত"।

বারমাস—১২৮৩ সালে মোহাম্মদ আকবর ইহা রচনা করেন।

মফিদল ইসলাম—১৩০১ সালে মক্কা প্রবাসী মৌলবী আব্দুল করিম ইহা রচনা করেন।

মউতনামা—১২৮৩ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ গোলাজারে বাহারিয়া—১২৯৮ সালে রংপুর জেলার মুনশী রসুল মোহাম্মদ খোন্দাকার ইহা রচনা করেন।

মৌলুদ বাহারিয়া—১২৮২ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

নওখরিদ পাহাল্‌ওয়ান—১২৮৭ সালে ২৪ পরগণার মুনশী মোহাম্মদ ইস্‌হাক ইহা রচনা করেন।

নবচিকিৎসা বোধ—১২৪৩ সালে বরিশাল জেলার কবিরাজ শ্রীনবকুমার নাথ ইহা রচনা করেন।

কালুগাজী-চম্পাবতী—১৩০২ সালে হুগলী জেলার মোহাম্মদ মুনশী ইহা রচনা করেন।

সয়ফল মুল্লুক বদিওজ্জমাল—১২৮৪ সালে মুনশী আব্দুল আজিজ ইহা রচনা করেন।

লাইলীমজনু—১২৮৭ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী আব্দুল অহ্বাব ইহা রচনা করেন।

রাঁড়ের মক্করনামা—১৩১৬ সালে ঢাকা নারায়ণগঞ্জনিবাসী মুনশী রিয়াজদ্দিন ইহা রচনা করেন। দুই খণ্ডে সমাপ্ত।

গোলেহরমুজ—১২৮১ সালে হাওড়া জেলার মোহাম্মদ খাতের ইহা রচনা করেন।

সোলতানজমজমা—১২৮৮ সালে ২৪ পরগণার মুনশী গোলাম মওলা ইহা রচনা করেন।

মধুমালা—১২৫৮ সালে কুমিল্লার মুনশী সৈয়েদ জিন্নাতআলী ইহা রচনা করেন।

চেমনবাহার—চট্টগ্রামের পণ্ডিত ফাইমদ্দিন ১২৪৫ সালে ইহা রচনা করেন।

ছিলছত্ররাজার জঙ্গ—১২৪৬ সালে বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল নিবাসী বাতাসু সরকার ইহা রচনা করেন।

দেলারাম—১৩১৮ সালে কলিকাতা নিবাসী মুনশী রিয়াজদ্দিন খাঁ ইহা রচনা করেন।

লালমতি—১২৯৫ সালে চট্টগ্রামের পণ্ডিত আব্দুল হাকিম ইহা রচনা করেন। ইহার সম্পূর্ণ নাম, "লালমতি-সয়ফল মুল্লুক"।

কলির নসিহত—১২৭০ সালে ২৪ পরগণার চানক নিবাসী শেখ রমজানউল্লা ইহা রচনা করেন।

জানুরওশন—১২৯০ সালে নদীয়া শান্তিপুর নিবাসী মোহরদ্দিন আহম্মদ ইহা রচনা করেন।

বিধবা বিচ্ছেদ—১৩০৩ সালে বরিশাল চাঁদপাশা নিবাসী সলিমউদ্দিন ইহা রচনা করেন।

নেকবিবি—১২৯২ সালে ঢাকা রহমাগঞ্জ নিবাসী মুনশী গরীবউল্লা ইহা রচনা করেন।

সত্যপীর—১২৮৬ সালে ওয়াজেদ আলী ইহা রচনা করেন।

তমিম গোলাল—১২৭১ সালে চট্টগ্রামের সৈয়েদ মোহাম্মদ রাজা ইহা রচনা করেন।

সয়ফল মুল্লুক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ আলাওল পণ্ডিত ইহা রচনা করেন। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

দাকায়েক-উল্ হেকায়েক—চট্টগ্রামের সৈয়েদ মৌলবী নুরুদ্দিন ইহা রচনা করেন। ইহার অপর দুইটী নাম, "রুহনামা ও মউতনামা"।

জেবল-মুল্লুক সামারোক—ইহা চট্টগ্রামের সৈয়েদ আকবর আলী দ্বারা বিরচিত। রচনার সন-তারিখ আজিও আমরা প্রাপ্ত হই নাই।

উপরে যে সমস্ত পুস্তকের নাম এবং রচনার সন-তারিখ সহ গ্রন্থকারদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিলাম। তালিকায় লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) আরবী ও পার্সী ভাষায় লিখিত, ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকের মূল এবং তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ। (ক) শরিয়ৎ—গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, (খ) মারফৎ—সন্ন্যাসধর্ম্ম।

(২) জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক, তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতির বিচার। গণনা-প্রণালী। স্বপ্ন-বিচার সম্বন্ধীয় পুস্তক। কু-ফল দূর করিবার ব্যবস্থা।

(৩) পশু ও মানব চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক। (ক) আয়ুর্ব্বেদ, (খ) পেঁতে, (গ) হাকিমী, (ঘ) অবধৌতিক।

(৪) দোওয়া, এসেম ও কবচ (তাবিজ) ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক।

(৫) দেহতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক।

(৬) সাধনা-প্রণালী এবং সিদ্ধি লাভের উপায় সম্বন্ধীয় পুস্তক।

(৭) মিলনাত্মক ও বিয়োগান্তক উপন্যাস (প্রেম-কাব্য)।

(৮) নাটক (প্রহসন ও গীতাভিনয়)।

(৯) সমাজচিত্র, সংসারচিত্র—চাবুক।

(১০) ইতিহাস এবং ইতিহাসের ছায়া।

(১১) জীবন-চরিত।

(১২) বিবিধ উপদেশ।

এ সম্বন্ধে বলিবার ও আলোচনা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় অন্তকার মত ইহার উপসংহার করিলাম। সময় ও সুযোগানুসারে কবিদিগের রচনা-শক্তির ও কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। প্রায় সহস্র বৎসর হইতে চলিল, এ দেশে আমরা হিন্দু-মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায় বাস করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু ভ্রাতারা ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানেন না। তাই তাঁহারা অনেক সময়, ইসলাম ধর্ম্ম এবং মুসলমানদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক ভুল ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ইহা যে অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিত "বটতলার পুথি"গুলিকে ঘৃণা না করিয়া, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহারা পাঠ করেন, তাহা হইলে, মুসলমান ধর্ম্ম ও মুসলমানের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল ধারণাগুলি দূর হইতে পারে। আমি এই প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বলিয়াছি যে, "আমার অনুসন্ধান-কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই এবং বহুসংখ্যক পুস্তক এখনও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" সকল পুস্তকগুলি সংগৃহীত এবং অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইলে উহার এক এক খণ্ড পুস্তক সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তক-ভাণ্ডারে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

কণিকাগুলির বিভিন্ন প্রকারের গতিদ্বারা বুদ্ধিতে বিভিন্ন ভাব জন্মিতেছে। সুতরাং বিভিন্ন সভ্যের নিকট বিভিন্ন প্রকারে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হইতেছি। সেই নিন্দা ও প্রশংসার প্রতিফলিত আঘাত মস্তিষ্কস্থিত কণিকা চালিত করিয়া চক্ষু ও মুখের কণিকায় আসিয়া পঁহুছিতেছে এবং তাহাদের চালনাতেই আমরা সভ্যবৃন্দের অভিমতের আভাস পাইতেছি। কণিকার পথ রেখা। সুতরাং জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সবই রাশি রাশি রেখা উৎপন্ন করিয়া।

কণিকাগুলির পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে কার্য্য হইতে পারে না। এই ঘাত-প্রতিঘাতে কণিকার গতি বিভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন সুশৃঙ্খলিত থাকিলেই তাহাদের সমষ্টি কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

কণিকার গতিপথে অপর একটি কণিকা পতিত হইলে উক্ত কণিকার গতি পরিবর্ত্তিত হয়। অর্থাৎ কণিকা যে যে বিন্দু অতিক্রম করিয়া যাওয়ার কথা ছিল, তন্মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কণিকা যে বিন্দুতে উপস্থিত হইত, সেই বিন্দুতে অপর একটি কণিকা থাকায়, একই সময়ে একই বিন্দুতে একাধিক কণিকার অবস্থিতি অসম্ভব হেতু গতিবিশিষ্ট কণিকা সেই সময়ে অপর একটি বিন্দুতে উপস্থিত হয় এবং তৎসঙ্গে গতিপথও পরিবর্ত্তন করে। যে বিন্দুতে যাওয়ার পরে পরবর্ত্তী বিন্দুতে উপস্থিত হইতে না পারায় কণিকাটির গতি পরিবর্ত্তিত হয়, উক্ত পরবর্ত্তী বিন্দুকে সেই বিন্দুর সংযুক্ত বিন্দু বলে। যে কোন বিন্দুর সঙ্গে মাত্র কয়েকটি বিন্দু সংযুক্ত ভাবে অবস্থিত। অধিকাংশ বিন্দুই অসংযুক্ত। কণিকা যে কোন বিন্দু অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদাই তাহার সংযুক্ত অপর এক বিন্দুতে উপস্থিত হয়। সুতরাং রেখার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুগুলির পরস্পর সম্পর্ক প্রকাশ করিতে হইলে কতকগুলি সংজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন। নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

পর্য্যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পরিচয় পরস্পর-সাপেক্ষ। ইহাদের পরস্পরে নিম্নলিখিত তিনটি সম্পর্ক আছে ;—

১। যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত মাত্র যে কোন একটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

২। যে কোন পর্য্যায়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত যে কোন দুইটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত যে কোনটিকে পূর্ব্ববর্ত্তী রূপে ধরিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইতে অন্যটি পরবর্ত্তী।

৩। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থ থাকিলে উক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব্ববর্ত্তীটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীটি পরবর্ত্তী।

অনুমান। যে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পদার্থ কয়টির সংখ্যা তিন ভিন্ন অপেক্ষা লঘুতর নয়।

১ম প্রতিজ্ঞা

কয়েকটি পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

যদি উক্ত কয়েকটি পদার্থের সংখ্যা তিন হয়, ক, খ ও গ তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা তদন্তর্ভুক্ত অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী ক ও খ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটি পরবর্ত্তী।

মনে কর, ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও খ পদার্থ পরবর্ত্তী।

ক ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী পূর্ব্ববর্ত্তী ও অন্যটী পরবর্ত্তী।

যদি ক পদার্থ পূর্ব্ববর্ত্তী ও গ পদার্থের পরবর্ত্তী হয়, তবে ক পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

যদি গ পদার্থ ক পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, ক পদার্থ খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব গ পদার্থ খ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

অতএব গ পদার্থ অন্য যে কোন পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

* * * * * *

২য় প্রতিজ্ঞা

কয়েকটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত এরূপ একটি পদার্থ থাকিবে, যাহা অন্য যে কোন পদার্থের পরবর্ত্তী।

[প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিজ্ঞার ন্যায়]

সংজ্ঞা

যে কোন পদার্থকে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদার্থের মধ্যবর্ত্তী পদার্থ বলে।

৩য় প্রতিজ্ঞা

তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটি অন্য দুইটির মধ্যবর্ত্তী হইবে। ক, খ ও গ তিনটী পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্য দুইটীর মধ্যবর্ত্তী হইবে।

ক, খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্য দুইটীর পূর্ব্ববর্ত্তী।

মনে কর, ক পদার্থ খ ও গ পদার্থের পূর্ব্ববর্ত্তী।

খ ও গ পদার্থের অন্তর্ভুক্ত একটী অন্যটীর পরবর্ত্তী।

মনে কর, গ পদার্থ খ পদার্থের পরবর্ত্তী।